দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 NOV 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

222

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

জাতীয়কৃত সরকারী কলেজসমূহের কর্মরত শিক্ষকদের ফরিয়াদ

আমরা জাতীয়কৃত সরকারী কলেজসমূহের শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে, সরকারের জাতীয়করণের নীতিমালা মোতাবেক ৭ বছরের ইফেকটিভ সার্ভিসের ভিত্তিতে আমাদের কতিপয় সহকর্মীকে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে আত্মীকরণ করা হয়, অথচ একই তারিখে যাদের ইফেকটিভ সার্ভিস ৭ বছরের সামান্য কম ছিল অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ কি ছয় বছর ইত্যাদি রূপে ছিল তাঁরা জাতীয়করণের ৮/১০ বছর পরেও অদ্যাবধি প্রভাষকই রয়েছেন। একইভাবে যাঁরা নিয়মিতভাবে পিএসসি'র মাধ্যমে প্রভাষক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন তারাও আজ ১২/১৪ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রভাষক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এখানে আরো লক্ষণীয় যে, বেসরকারী কলেজসমূহে সরকারের আত্মীকরণের নীতিমালা অনুযায়ী ৭ বছরের চাকরিকালের ভিত্তিতে প্রভাষকদেরকে সহকারী অধ্যাপক পদে উন্নীত করে উক্ত পদের স্কেল প্রদান করা হচ্ছে এবং সরকারও অনুদান হিসেবে উহার ৭০% ভাগ বেতন প্রদান করছেন। অথচ আত্মীকৃত সরকারী কলেজের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকার যেন নিজের প্রণীত জাতীয়করণের নীতিমালা নিজেই ভঙ্গ করে চলেছেন।

আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, জাতীয়করণের সময়ে শুধুমাত্র চাকরিকাল গণনা করে ইফেকটিভ সার্ভিসের ভিত্তিতে ৭ বছরে পদোন্নতি দান করা হয়েছে। অথচ জাতীয়করণের পর থেকে বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতির রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে বাংলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, রসায়ন, পদার্থ, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষকগণ সহযোগি অধ্যাপকের অভিজ্ঞতা অর্জন করেও প্রভাষকের ঘানি টানছেন। অথচ পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকগণ ৭বছর চাকরিকাল পূর্তি হওয়ার পূর্বেই পদোন্নতি লাভ করছেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, উল্লিখিত বিষয়সমূহের কোন কোন আত্মীকৃত শিক্ষক হয়তো প্রভাষকই রয়ে গেছেন, অথচ তাদেরই ছাত্ররা বিষয়-ভিত্তিক পদোন্নতির আশীর্বাদে সহকারী।সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন। আর এভাবেই অনেক আত্মীকৃত শিক্ষককে (ছাত্র-শিক্ষক জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সহকর্মী)র গ্লানি সহ্য করে দারিদ্র্যের ঘানি টানতে হচ্ছে।

বিষয়টি আরো দুঃখজনক এই জন্য যে, সরকার ১৯৮৫ সালে সংশোধিত বেতন স্কেল প্রবর্তন করে ১ম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদেরকে টাইম-স্কেল প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন, অথচ দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে নীচের দিকের কর্মচারীরা টাইম স্কেলের সুবিধা পাচ্ছেন। ফলে ১ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী যে বেতন পাচ্ছেন তারই অধীনস্থ কোন কোন কর্মচারী তার সমান অথবা কোথাও কোথাও তার চেয়ে বেশি বেতন পাচ্ছেন। এতে স্বভাবতই ১ম শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীবৃন্দ অবমূল্যায়িত হচ্ছেন এবং সমাজের চোখেও তারা হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছেন।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, জাতি-গড়ার এ হতভাগ্য কারিগরদেরকে এহেন দুঃখজনক অবস্থার হাত থেকে মুক্তি দেয়ার কোন কর্তৃপক্ষ আছেন কি?

আত্মীকৃত শিক্ষকদের পক্ষে
আবুল হোসাইন

প্রসঙ্গ: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার

এইচএসসি পরীক্ষাতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার এখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ থাকা নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের যুক্তি যে, ছাত্ররা ক্যালকুলেটর পেলে সাধারণ গণনার ক্ষেত্রেও এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং ক্যালকুলেটর মূল্যবান যন্ত্র বলে সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এর ব্যবহার সম্ভব নয়।

কিন্তু ক্যালকুলেটর ব্যবহারে এ দুটো যুক্তি মোটেও ধোপে টেকে না। বরং ক্যালকুলেটর ব্যবহারের স্বপক্ষেই যুক্তি থাকে বেশী।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পদার্থবিদ্যায় যেসব অংক থাকে সেগুলো তাত্ত্বিক মেধা যাচাই করার জন্য, বোধশক্তির মান নির্ণয়ের জন্য--- কোনক্রমেই গণনাক্ষমতা আঁচ করার জন্যে নয়। এক্ষেত্রে ছাত্র যদি তত্ত্বগত দিক বুঝে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে তবে অংকের সময়ের বাড়তিটুকু কমাতে পারে।

আমরা স্বীকার করি, এক সময় ক্যালকুলেটর দুর্লভ ও দুর্মূল্য ছিল। দাম ছিল আকাশচুম্বী আর আকার ছিল ঢাউস। কিন্তু এখন এ যুক্তি নিরর্থক, কারণ, পকেট ক্যালকুলেটরগুলো এখন অতি সুলভ এবং সহজলভ্য। এমন কি একটা মাঝারি গোছের রসায়ন কিংবা পদার্থবিদ্যা বইয়ের চেয়ে কম দামে ও ক্যালকুলেটর পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং যে ছাত্র একটা পাঠ্যবই কিনতে পারে সে কেন ক্যালকুলেটর কিনতে পারবে না? এছাড়া প্রয়োজনবোধে কলেজগুলোতে বোর্ডের তরফ থেকে সুলভ ক্যালকুলেটর বিতরণ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে দেখা গেছে, সাহসী অনেক ছাত্র লুকিয়ে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করছে। পাশাপাশি অনেক সুবোধ ছাত্র সাহস পাচ্ছেনা পাছে ধরা পড়ে যাবে বলে। ফলে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হচ্ছে। ক্যালকুলেটর ব্যবহারে অনুমতিই শুধুমাত্র এ ব্যবধান ঘুচাতে সক্ষম।

ক্যালকুলেটর এখন আর বিলাসিতা নয়--এটা প্রয়োজন। সুতরাং পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহারে অনুমতি দেয়ার, জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

রাহাত আইয়ুব,
নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

আমাদের অনার্স কবে শেষ হবে?

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র। হিসেব মত পাঁচটা শিক্ষাবর্ষ চলছে, কিন্তু আমাদের অনার্স এখনও শেষ হয়নি। আমরা এখন ৫ম সেমিস্টার পরীক্ষা দিচ্ছি। অথচ আমাদের সাথের অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররা অনার্স ফাইনাল দিচ্ছেন। কমার্স ফ্যাকাল্টির অন্যান্য বিভাগের এই শিক্ষাবর্ষের ছাত্ররা অনার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা (৬ষ্ঠ টার্ম ফাইনাল) দিচ্ছেন। যেখানে একের পর এক সেসন জটে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, অভিভাবকরা পড়াশুনার খরচ চালাতে হাঁপিয়ে উঠেছেন। সেখানে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে ব্যর্থতা, শিক্ষকদের ক্লাস মিস করা ইত্যাদি মিলিয়ে আমরা একটা নাজুক পরিস্থিতিতে আছি। এছাড়া এ বিভাগের অন্যান্য ক্লাসগুলোও সহপাঠিদের চেয়ে অন্তত এক টার্ম (৬ মাস) পিছিয়ে আছে। মাননীয় উপাচার্যসহ, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকগণের প্রতি অনুরোধ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের অনার্স কোর্স শেষ করার চেষ্টা করবেন।

আনিসুল হক
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।